একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক

আবীর হাসান

অনেক কিছু হয়েছে, আবার হয়ওনি এই এক দশকে। অন্তত বিজ্ঞান-প্রযুক্তি নিয়ে যে স্বপ্ন বা আশা ছিল পৃথিবীর তাবৎ মানুষের, তা পূরণ হয়নি। না হলো ভিনগ্রহে উপনিবেশ, না হলো টেলিপোর্টেশন। রোবটিক কালচার বলেও তো কিছু গড়ে উঠলো না। এমনকি অটোমেশন যতটা আশা করা গিয়েছিল, ততটাও অর্জন করতে পারেনি এ বিশ্বের মানবসমাজ। অথচ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে কী স্বপ্নটাই না দেখতে শুরু করেছিল বিশ্ববাসী। কারণ, ততদিনে কমপিউটার আর রোবটিক্সের অনেকটাই এসে গিয়েছিল আয়ত্তে। আর তাতেই ইউনিভার্স বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার আশা করেছিল মানুষ এবং তা শুধু গাল-গল্পে নয়, রাজনৈতিকভাবেও ওই সব স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা শুরু হয়ে গিয়েছিল বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক থেকেই। আশা ছিল নব্বইয়ের দশকের মধ্যেই মানুষের উপনিবেশ গড়ে উঠবে ভিনগ্রহে, আর পৃথিবীতে মানুষ চলাচল করবে টেলিপোর্টেশনের মাধ্যমে। জ্বালানি নিয়ে সমস্যা থাকবে না। কারণ, পার্টিকেল ফিজিক্স সবরকম পরিবহন ও যোগাযোগের উপায় বাতলে দেবে। কিন্তু এরকম যে হয়নি তা আমরা দেখতেই পাচ্ছি। তবে যা হওয়ার কথা ছিল না তেমন কিছু হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম দুটো হলো ইন্টারনেট আর মোবাইল ফোন। এ দুটো প্রযুক্তিবিশ্বের সাধারণ মানুষ ব্যবহার করছে কমবেশি দু'দশক ধরে। এসব নিয়ে উন্মাদনারও কমতি এখন পর্যন্ত ঘটেনি বরং নতুন নতুন উত্তেজনা ছড়াচ্ছে দিন দিন। তবুও সহস্রাব্দের প্রথম দশক যখন শেষ হয়েছে, তখন মনে হয় তুল্যমূল্য যাচাইয়ের একটা অবকাশ রয়েই যায়। বিশেষ করে মানবসভ্যতায় কোনো গুণগত পরিবর্তন এসবের মাধ্যমে এসেছে কিনা কিংবা এসে থাকলে তা কতটা!

আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়– একবিংশ শতাব্দী 'শান্তির সময় হবে' বলে যে স্বপ্ন ছিল তাও ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল দশকটা শুরুর লগ্নেই। নাইন ইলেভেন আর ইরাক ও আফগান যুদ্ধ সভ্যতার কলঙ্ক হয়ে উঠেছে। তবে অবশ্যই যুদ্ধগুলোও হচ্ছে 'হাইটেক'– অসম হলেও। কিন্তু মানবজাতি একটা বিষয় প্রমাণ করেছে, যুদ্ধ ছাড়া তার সভ্যতা এগোয় না। বিংশ শতাব্দীতে দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধের পর শান্তির যে ললিত বাণী তার মুখে উঠে এসেছিল, যে মূল্যবোধ আর ঔচিত্যের কথা বারবার বলা হচ্ছিল– তা যে আসলে তার স্বভাববিরুদ্ধ আস্ফালন বৈ নয়, তা প্রমাণ হয়ে গেছে। যুদ্ধ করে করেই মানুষ তার সভ্যতাকে এগিয়ে নেবে, পুরনো সভ্যতাকে ধ্বংস করতে মানবতার তোয়াক্কা করবে না! এটা যেন অবধারিত। আর উন্নত প্রযুক্তি যে উত্তেজনা বা যুদ্ধের উন্মাদনা কমায় না বরং বাড়ায় সেটা বিশ্ববাসী হাড়ে হাড়ে বুঝছে।

এ উপলব্ধিও মানুষের হয়েছে, হাইটেক মানেই শনৈঃ শনৈঃ অর্থনৈতিক উন্নতি নয়, সভ্যতাকেও ডিজিটাইজ করা যায় না সদিচ্ছা না থাকলে। এও এখন বোঝা যাচ্ছে, টেকনোলজি উৎপাদনে বৈচিত্র্য এবং পরিমাণগত উৎকর্ষ সাধন করলেও পুঁজিবাদের চিরচরিত সঙ্কট ঠেকাতে সক্ষম নয়। তথ্যের শক্তিও তো পারল না মহামন্দা ঠেকাতে। আর মন্দা থেকে বেরিয়ে আসার প্রক্রিয়াটা লেজেগোবরে হয়ে গেছে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের বেইল আউট ফিন্যান্সিং সত্ত্বেও।

'কী চেয়েছি আর কী যে পেলাম'– ধরনের অস্বস্তি নিয়ে একবিংশ শতাব্দী তথা তৃতীয় সহস্রাব্দের প্রথম দশকটা কাটিয়েছে বিশ্ববাসী। কারণ, ঘটনা যেগুলো ঘটেছে সেগুলো অভাবিত। তবে শুধুই দুঃসহ ব্যাপার ঘটেছে তা তো নয়, অনেক কিছু মানুষ পেয়েছে যেগুলো নিয়ে গর্ব করা যায়।

একটা সময় ছিল যখন প্রযুক্তি শুধু প্রযুক্তিবিদরাই ব্যবহার করবে এমন একটা ধারণা ছিল। এখন কিন্তু সে ধারণাটা ভেঙে গেছে এই তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণেই আর মোবাইল ফোন তো বৈপ-বিক পরিবর্তনই ঘটিয়ে দিয়েছে। কার কাছে এখন নেই এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তিটা! সাক্ষর-নিরক্ষর নির্বিশেষে আপামর জনতা যাকে বলে– সবাই ব্যবহার করছে। একাকার হয়ে গেছে দেশ-বিদেশ, দুর্গম-অগম্য জায়গায়ও।

মোবাইল ফোনের সঙ্গে ইন্টারনেটের মিথষ্ক্রিয়াও তৈরি করেছে নতুন অনুষঙ্গ। সব দেশের ডাক বিভাগ বসে আঙুল চুষছে। এমনকি সেই 'ফিলাটেলিক' ব্যাপারটাও বলতে গেলে উঠে গেছে। ডাকটিকেটের আগ্রহ নতুন প্রজন্মের আর নেই বললেই চলে। এরকম অনেক অভ্যাসই বদলে ফেলেছে পুরনো মনুষ্যও। ই-মেইল, ফেসবুক বা টুইটার বাড়িয়ে চলেছে পরিচিতের গণ্ডি। চিঠির জন্য হাপিত্যেশ করে বসে থাকার দিন শেষ। শেষ হয়ে গেছে বিকল্প বিনোদনের জন্য অপেক্ষার পালাও। খেলা, গান শোনা, সিনেমা দেখা সবই এখন পিসিনির্ভর। পড়তে পড়তে, কাজ করতে করতে একটু বিনোদন সবাই উপভোগ করছে।

খাটো করে যদিও দেখার উপায় নেই এ অর্জনগুলোকে, তবুও মানবসভ্যতার মাইলফলক স্থাপনের যে বাসনা বছর পঞ্চাশেক আগে মানুষ করেছিল তার বাস্তবায়ন না হওয়ায় একটা আক্ষেপ কেমন যেন অনেকের বুকে চিন্ চিন্ করে চলেছে।

আসলে এটা হচ্ছে নিরিখের ব্যাপার। নিরীক্ষাটা আকাশচুম্বী ছিল বলে অনুযোগ উঠতে পারে, তবে একটা প্রশ্ন কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক নয়– এই যে কমপিউটার আর তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষমতা ও শক্তি তা কি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারছে মানুষ? বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কমপিউটিং এবং গতিশীল তথ্যের শক্তিকে কি ব্যবহার করা যাচ্ছে? এ প্রশ্নটির উত্তর নেতিবাচক না হয়ে উপায় নেই। অথচ তা হওয়ার কথা ছিল না। তবে কি উন্মেষ পর্বে নতুন প্রযুক্তি মেধার অপচয় ঘটিয়েছে? কিছুটা হওয়া অসম্ভব নয়। ষাট-সত্তর দশকে পদার্থ বিজ্ঞান এবং গণিতের চর্চায় যে আর্তিটা ছিল তা এই একবিংশ শতাব্দীতে এসে কিন্তু দেখা যাচ্ছে অনেক ঢিলেঢালা হয়ে গেছে বিষয়গুলোর চর্চা। মহাকাশের চেয়ে অর্থাৎ স্পেসের চেয়ে সাইবার স্পেসই এখন তরুণদের বেশি টানছে। গণিত বা পার্টিকেল ফিজিক্সের চেয়ে অনেককে বেশি টানছে কমপিউটার সায়েন্স। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে লক্ষ্যটা কী? নেহাতই চাকরি বা ব্যবসায়? গবেষণা করা, বিশ্বকে নতুন কিছু দেয়া অর্থাৎ মানবসভ্যতার হার্ডল টপকানোর মতো কিছু একটা করার প্রত্যয় কমে যায়নি? আগে দেখা যেত স্পেস নিয়ে অনুন্নত দেশের ছেলেমেয়েরাও ভাবছে, এমনকি রোবটিক্স নিয়েও এটা-ওটা করার চেষ্টা ছিল। কিন্তু এখন যেন কেবল উন্নত দেশের তথ্য জেনেই সন্তুষ্ট থাকছে আমাদের মতো দেশের তরুণরা। তথ্য জানার উপযোগিতা নিয়েও তাদের দ্বিধাদ্বন্দ্ব আছে। সরকারের দিক থেকেও বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিষয়টাকে কমপিউটারবিষয়ক ব্যাপার করে তোলা হয়েছে। আমাদের একটি সরকারি বিজ্ঞান গবেষণাগার আছে, তবে সেখানে 'উন্নত চুলা আর আচারের মতো খাদ্য ►

প্রক্রিয়াকরণ নিয়ে' কাজ হয় বেশি।

বিশ্ব থেকে দেশের দিকে ফিরে, গত দশকটাকে নিয়ে পড়লে দেখা যাবে উন্নতি বা ঢেকনার মান বেড়েছে। প্রযুক্তিনির্ভরতা বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তির নির্ভরতা সাধারণ মানুষের মধ্যে বেড়েছে। মোবাইল ফোনের প্রাপ্তি চাহিদা এদেশে সম্ভবত অন্য যেকোনো সমপর্যায়ের অর্থনৈতিক শক্তির দেশের চেয়ে বেশি। অন্যান্য ইলেক্ট্রনিক্স পণ্যের চাহিদাও বাড়ছে। কিন্তু সেই প্রশ্নটা– সেই কমপিউটিংয়ের সত্যিকার গাণিতিক শক্তি এবং তথ্যের ক্ষমতাকে কতটা কাজে লাগানো যাচ্ছে বা গেছে এদেশে।

মোবাইল ফোনের ব্যাপক যাত্রাকালে ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতাদের সাথে এর একটা সম্পর্কের সূচনা হয়েছিল, কিন্তু সেটা দারিদ্র্য দূরীকরণে তেমন সহায়ক ভূমিকা কি রাখতে পেরেছে? এ প্রশ্নের উত্তরটা সবাই দিতে পারবেন, কারণ ক্ষুদ্র ঋণের অবদান নিয়ে এখন জাতীয় বিতর্ক চলছে। আসলে আমরা তত্ত্বিকভাবে জানি তথ্যপ্রযুক্তি এবং মোবাইল ফোন দারিদ্র্য দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু সেই তত্ত্বের প্রয়োগ অনেক আগেই হওয়ার কথা থাকলেও গত দশ বছরে ঠিকমতো হয়নি। মাত্র শোনা যাচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদগুলোয় ইন্টারনেট সংযোগসহ কমপিউটার দেয়া হবে। শোনা যাচ্ছে শিক্ষার জন্য কম দামের ল্যাপটপ দেশেই তৈরি হবে।

এগুলোর বাস্তবায়ন খুব জরুরি ব্যাপার ছিল অনেক আগেই আর সেই তাগিদ বার বার দেয়ার জন্যই অধ্যাপক আবদুল কাদের এই কমপিউটার জগৎ পত্রিকাটির প্রকাশনা শুরু করেছিলেন। বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তির যাত্রাপথের একনিষ্ঠ সাক্ষী এই কমপিউটার জগৎই। কী হয়েছে, কী হবে, আর কী কী হওয়া উচিৎ সব কিছুই লেখা হয়ে আসছে এ পত্রিকায়।

যা হোক মোটা দাগে এবার উপসংহারটা টানতে হয়। দেশের বা মানবসভ্যতার উৎকর্ষ সাধন করতে গেলে একমুখী নয়– বহুমাত্রিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটাতে হবে। সবাইকে একই কাজ করতে হবে, এমন কোনো কথার দিব্যি তো কেউ দেয়নি। তবে যুগের প্রযুক্তির দিকে টান সব মানুষেরই থাকে, সবাই দেখতে চায় রহস্যটা। আর এমন 'সাধারণ মানুষের প্রযুক্তি' তো আগে আসেনি...! তো এক দশকের দেখা-শোনা হলো, এখন সময় এসেছে প্রযুক্তির প্রায়োগিক দিকগুলো বিবেচনা করে বাস্তবায়নের।

ইতোমধ্যে আমরা দেখেছি, আমাদের অনেক অভিনব উদ্যোগ দেশের বাইরেও সমাদৃত ও পুরস্কৃত হয়েছে। আমাদের ছাত্রছাত্রীরা গণিত অলিম্পিয়াডে দেশের মুখ উজ্জ্বল করছে। কিন্তু আমাদের ব্যর্থতা সম্ভবত প্রতিভার জন্য সুযোগ সৃষ্টি না করতে পারা। মোদ্দা কথা যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো, আরঅ্যান্ডডির ক্ষেত্রে সৃষ্টি করা। গবেষণা ও উন্নয়নের বিষয়টি এখনও আমাদের শিল্প-বাণিজ্যের পরিমণ্ডলে শুরুই হয়নি। এ বিষয়টি নিয়ে কথা উঠলেই মনে হয় বিষয়টা সরকারের এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোরই ব্যাপার। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, যেসব দেশ উন্নতি করেছে বা উন্নতি করছে, তারা সরকারি এবং বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই আরঅ্যান্ডডি-কে প্রাধান্য দিচ্ছে। সব গবেষণা হয়তো সাফল্যের মুখ দেখে না। কিন্তু কাজগুলো করতে দেয়া হয় বলেই একটা-দুটো বাণিজ্যিকভাবে সফল প্রকল্প পাওয়া যায়। সেগুলো পরে ব্যবসায়ও করে।

আমাদের বিগত এক দশকের অভিজ্ঞতা এবং আগের কয়েক বছরের স্মৃতি যা বলছে তা হলো, এখন সময় এসেছে গাল-গল্প ও স্বপ্ন-আশার কথা একটু কম বলে জরুরি কাজগুলো করা।

সারা পৃথিবীই অনেক কিছু করতে চেয়েও করতে পারেনি– এটা সত্যি কথা। তবে অন্যেরা পারেনি বলে আমরা পারব না, এটাও তো ঠিক নয়। ভিত্তিমূলক বিষয়গুলো নিয়েও তো আমাদের দেশে গবেষণা চলতে পারে। এজন্য বিজ্ঞানবিষয়ক মন্ত্রণালয়টিকে আর একটু শক্তিশালী করা এবং সরকারি বিজ্ঞান গবেষণাগারটিকে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর করাও খুব জরুরি।